ইউনিট ২২

চিংড়ি চাষ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের দেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর এবং বিশাল উপকূলীয় এলাকায় রয়েছে চিংড়ি চাষের বিপুল সম্ভাবনা। এদেশের জলাশয়ে রয়েছে ৬৭টি প্রজাতির চিংড়ি। তবে প্রধানত গলদা ও বাগদা এই দুইটি প্রজাতির চিংড়িই চাষ হয়ে থাকে। গলদা মিঠাপানির পুকুর-দিঘীতে আর বাগদা উপকূলীয় এলাকায় চাষ হয়ে থাকে। চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। তাই চিংড়ি চাষে এদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

এই ইউনিট শেষে আপনি চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা, চাষাবাদ পদ্ধতি, চিংড়ির খাদ্য, খাদ্য তৈরী ও প্রয়োগ ব্যবস্থা, স্বাদু ও লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের পদ্ধতি, চিংড়ির রোগ-বালাই, চিংড়ি ও মৎস্য রপ্তানির অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

পাঠ ২২.১

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা ও চাষাবাদ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চিংড়ির বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আমাদের দেশে যে সব পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

চিংড়ির চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর চিংড়ি চাষের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। আমাদের দেশে সাধারনত: নিম্নলিখিত চাষাবাদ পদ্ধতি দেখা যায় ঃ

সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

১. সনাতন পদ্ধতি
২. উন্নত- হালকা পদ্ধতি
৩. আধা - নিবিড় পদ্ধতি
৪. নিবিড় পদ্ধতি

১. সনাতন পদ্ধতি

এটি আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরনো পদ্ধতি। এক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ পুরোপুরি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। পরিকল্পিত উপায়ে খামার নির্মাণ করা হয় না এবং কম পুঁজি বিনিয়োগ যোগ্য। এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার দেয়া হয় না। এমনকি বাড়তি কোন খাবারও দেয়া হয় না। এ পদ্ধতিতে পানি ব্যবস্থাপনার সুযোগ না থাকায় চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছও একত্রে চাষ হয়ে থাকে। এ ধরনের খামারে সাধারনত: প্রাকৃতিকভাবে জোয়ারের পানি প্রবেশের মাধ্যমে পোনা মজুদ করা হয়। এছাড়া বর্তমানে প্রতি বর্গ মিটারে ২-৪টি চিংড়ির পোনা মজুদ করা হয়। এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ১৫০-২০০ কেজি। বাংলাদেশের প্রায় ৯০% খামারে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে।

উন্নত-হালকা পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে ৩-৫ টি পোনা মজুদ করা হয় এবং বছরে দুটি ফসল উৎপাদন করা হয়।।

২. উন্নত-হালকা পদ্ধতি

এ পদ্ধতি কম ঝুঁকিপূর্ণ, লাভজনক ও কম প্রযুক্তি নির্ভর বিধায় আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে রাক্ষুসে মাছ নিধন, পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং মাটি ও পানির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য চুন ও সার প্রয়োগ করা হয়। বাড়তি খাবার হিসাবে সম্পূরক খাবার দেয়া হয়। এ ধরনের চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে ৩-৫টি পোনা মজুদ করা হয় এবং বছরে দুটি ফসল উৎপাদন করা হয়। এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি প্রায় ৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা যায়।

আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য বেশী পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় এবং দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়।

৩. আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতি

আজকাল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। এ চাষ পদ্ধতি সম্প্রতি আমাদের দেশেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য বেশী পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় এবং দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়। এ চাষ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর পুকুরের ৩০-৫০% পানি পরিবর্তন করতে হয়। পুকুর বা খামারের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন সরবরাহের জন্য প্যাডেল হুইল বা অন্য কোন বাতাস সরবরাহের যন্ত্র থাকতে হয়। সাধারনত: প্রতি বর্গ মিটারে ১০-১৫টি পোনা মজুদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ৩-৫ টন চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

৪. নিবিড় চাষ পদ্ধতি

হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার প্রাপ্যতা এবং উন্নত মানের পিলেট জাতীয় খাদ্য নিবিড় চাষ পদ্ধতির পূর্বশর্ত।

এ চাষ পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কিন্তু অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। নিবিড় চাষে উচ্চ ফলনের লক্ষ্যে প্রয়োজন কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোথাও এ পদ্ধতির প্রচলন নেই। তবে জাপান, চীন, থাইল্যান্ড ও তাইওয়ানে এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার প্রাপ্যতা এবং উন্নত মানের পিলেট জাতীয় খাদ্য এ চাষ পদ্ধতির পূর্বশর্ত। তাছাড়া নিবিড় পদ্ধতির চাষে প্রতিদিন পুকুরের পানি পরিবর্তন করতে হয় এবং অনবরত বা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পানিতে বাতাস সরবরাহ করতে হয়। এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ সাধারনতঃ অল্প আয়তনের পুকুরে করা যায়, যার আয়তন ০.১ হতে ১.০ হেক্টর পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতি বর্গমিটারে ১৫টির বেশী পোনা মজুদ করে ৫-১০ টন চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ ব্যাপক অবদান রাখছে।

চিংড়ি আমাদের দেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পন্য। বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে পোশাক শিল্পের পরেই চিংড়ির অবস্থান। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের দেশে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে চিংড়ি খামারের আয়তন ০.৬৪ লক্ষ হেক্টর হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১.৩৫ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। এ সমস্ত চিংড়ি খামারে উৎপাদন প্রায় ০.৯২ লক্ষ মে.টন (১৯৯৯-০০) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৪৯ লক্ষ মে. টনে (২০০০-০৯) দাঁড়িয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ২.৫ লক্ষ লোক পোনা আহরনের কাজে জড়িত। আর চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পেশার সাথে জড়িত লোকসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। সুতরাং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ও গ্রামীন কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ ব্যাপক অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের চিংড়ি চাষের সম্ভাবনার সম্ভাব্য দিক-সমূহ নিম্নে বর্নিত হলো -

- আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আমাদের দেশ থেকে অধিক পরিমানে চিংড়ি রপ্তানির সুযোগ রয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানি চিংড়ি চাষের অনুকূল।
- পোনা সহজলভ্য এবং কম পুঁজি বিনিয়োগযোগ্য।
- ধান ক্ষেত বা কার্পজাতীয় মাছের সাথে মিশ্র চাষও করা যায়।
- উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও নদী-নালা, পুকুর বা ডোবাতেও চিংড়ি চাষ করা যায়।
- আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারেও চিংড়ির চাহিদা রয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখা যায় যে, এদেশের মাটি, পানির ব্যবহার ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সর্বোপরি পুষ্টির চাহিদা ও আয় বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি চাষ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুশীলনী (Activity)

আপনার এলাকায় কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে তা বর্ণনা করুন এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আপনার মতামত লিখুন।

সারমর্মঃ

আমাদের দেশের বিশাল জলরাশীতে রয়েছে চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা। বর্তমানে আমাদের দেশে গলদা ও বাগদা এই দুইটি প্রজাতির চিংড়ি চাষ হচ্ছে। তবে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর চিংড়ি চাষের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে চিংড়ি চাষকে সনাতন, উন্নত-হালকা, আধা-নিবিড় এবং নিবিড় পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়। আমাদের দেশের প্রায় ৯০% খামারে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ১৫০-২০০ কেজি। উন্নত-হালকা পদ্ধতি কম ঝুকি পূর্ণ ও কম প্রযুক্তি নির্ভর বিধায় আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত। চিংড়ি আমাদের দেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানী পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পচ্ছে। তাই চিংড়ি চাষ এদেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২২. ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ মিটারে কয়টি চিংড়ি মজুদ করা হয়?
ক) ৫-১০ টি খ) ১০-১৫ টি
গ) ৩০-৪০ টি ঘ) ৫০-১০০ টি

২। উন্নত-হালকা পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ মিটারে কয়টি চিংড়ি মজুদ করা হয়?
ক) ১-২ টি খ) ৩-৫ টি
গ) ১০-২০ টি ঘ) ৩০-৫০ টি

৩। নিবিড় চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক নয়?
ক) এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কিন্তু অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব
খ) এই পদ্ধতিতে প্রতিদিন পুকুরের পানি পরিবর্তন করতে হয়
গ) এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বা অনবরত পানিতে বাতাস সরবরাহ করতে হয়
ঘ) এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ হয়

উত্তর : ১। খ ২। খ ৩। ঘ

পাঠ ২২.২

চিংড়ির খাদ্য, খাদ্য তৈরী এবং প্রয়োগ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- চিংড়ির উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাদ্যগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- চিংড়ির উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাদ্যগুলোর উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্পূরক খাদ্য তৈরীর পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চিংড়ির পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

অধিকাংশ চিংড়িই সর্বভূক। এরা পঁচা জৈব পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া, ডায়াটম জাতীয় শেওলা, নানা ধরনের এককোষী ও সুতাকৃতি শেওলা, নেমাটোড জাতীয় কৃমি, শামুক, পতঙ্গ, পচনশীল প্রাণীদেহ, উদ্ভিদ প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। চাষকৃত চিংড়ির খাদ্যকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। যথা ঃ প্রাকৃতিক খাদ্য এবং সম্পূরক খাদ্য।

১। প্রাকৃতিক খাদ্য

পুকুরে যদি প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমানে না থাকে তা হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না।

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। পুকুরে যদি প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমানে না থাকে তা হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না। আজকাল উন্নত পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে চিংড়ির নিবিড় চাষে ও পোনার লালনপালনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাদ্যের ব্যাপক চাষ করা হয়। সাধারনত: জৈব, অজৈব, সবুজ সার, সার কিংবা চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। চিংড়ির বা চিংড়ি পোনার উপযোগী প্রাকৃতিক খাদ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্চনীয় ঃ

- সহজেই গ্রহনযোগ্য হয়
- সহজ পাচ্য হয়
- পুষ্টিমান সমৃদ্ধ
- সহজেই চাষযোগ্য হয় এমন।

চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যে যে খাদ্য উপাদান থাকে তা আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, যথা - উদ্ভিদজাত এবং প্রানীজাত।

উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাদ্য সমূহের তালিকা:

উদ্ভিদজাত খাদ্য	প্রাণীজাত খাদ্য
নীলচে সবুজ শেওলা *(Blue green algae)*	কপিপড *(Copepod)*
- স্পাইরিউলিনা *(Spirulina)*	- সাইক্লপস *(Cyclops)*

- অসিলেটোরিয়া *(Oscillatoria)*	- ডায়াটোমাস *(Diatomus)*
- লিংবিয়া *(Lyngbya)*	ক্লাডোসেরা *(Cladocera)*
সবুজ শেওলা *(Green algae)*	- ড্যাফনিয়া *(Daphnia)*
- ক্লাডোফোরা *(Cladophora)*	- ময়না *(Moina)*
- ওডাগোনিয়াম *(Oedagonium)*	- বসমিনা *(Bosmina)*
- ডেসমিডস *(Desmids)*	রটিফেরা *(Rotifera)*
ডায়াটম *(Diatoms)*	- ব্রাকিওনাস *(Brachionus)*
- স্কেলেটোনেমা *(Sceletonema)*	- কেরাটেলা *(Keratella)*
- নেভিকুলা *(Navicula)*	ক্রাস্টেসিয়ান জাতীয় প্রাণী
- নিস্চিয়া *(Nitzchia)*	- আর্টেমিয়া *(Artemia)*
- সিনেড্রা *(Synedra)*	অস্ট্রাকডস *(Ostracods)*
সুত্রাকার শেওলা *(Flamentous algae)*	- সাইপ্রিস *(Cypris)*

চিংড়ির উদ্ভিদজাত খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি

ডায়াটম জাতীয় শেওলা চিংড়ির উত্তম খাবার।

চিংড়ির পৌষ্টিক নালী পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, বেশ কিছু সংখ্যক জলজ শেওলাকে এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে। তবে ডায়াটম জাতীয় শেওলা চিংড়ির উত্তম খাবার। ডায়াটম বা নীল সবুজ শেওলা চাষে ২০ লিটার পানি ধরে এমন একটি পলিথিন ব্যগ নিতে হয়। পানিতে রাসায়নিক সার হিসাবে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও সোডিয়াম/পটাসিয়াম সিলিকেট ১০০: ১০: ৫ অনুপাতে মিশিয়ে সামান্য পরিমানে ব্যবহার করা হয়। এরপর ঐ সার মিশ্রিত পানিতে ডায়াটম জাতীয় শেওলা বা নীল সবুজ শেওলার সামান্য অংশ বিশেষ প্রয়োগ করে ব্যাগটির মুখ ভালভাবে বেঁধে পুকুরের পানির আলোকিত স্থানে ৫-৭ দিন ভাসিয়ে রাখতে হয়। এভাবে ৫-৭ দিনের মধ্যেই পলিথিন ব্যাগে প্রচুর পরিমান ডায়াটম বা নীল সবুজ শেওলা লক্ষ্য করা যায় যা চিংড়ি বা চিংড়ির পোনার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

চিংড়ির প্রাণী জাতীয় খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি

চিংড়ির প্রাণী জাত খাদ্য তৈরীর জন্য আলোকিত স্থানে ছোট ছোট চৌবাচ্চা নির্মাণ করতে হয়। চৌবাচ্চা রাসায়নিক সার মিশ্রিত পানিতে (ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশিয়াম ১০: ৫: ৫ অনুপাতের) ভর্তি করে তাতে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগ্রহকৃত প্রাণীজাত খাদ্য ছাড়তে হয়। ৭-১০ দিন পর ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে চৌবাচ্চার পানির রং পরিবর্তন হয়েছে। এ থেকে বোঝা যাবে যে পানিতে প্রাণী জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে।

২। সম্পূরক খাদ্য

আধা নিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে যখন স্বল্প জায়গায় অধিক পরিমানে চিংড়ি মজুত করা হয়, তখন পুকুরের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাদ্য তাদের পুষ্টি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই দ্রুত বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন।

চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধির জন্য সম্পূরক খাদ্যে নিম্নরূপ পুষ্টিমান থাকা বাঞ্চনীয় ঃ

পুষ্টি উপাদান	পুষ্টিমানের শতকরা হার
শর্করা	৩০-৩৫%
স্নেহ বা চর্বি	৫-১০%

আমিষ	৪০-৬০%
ভিটামিন	১-২%
ফসফরাস	১%
ক্যালসিয়াম	২%

সম্পূরক খাদ্য তৈরী ও প্রয়োগ পদ্ধতি

চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, ফিসমিল, সরিষার খৈল, শামুক-ঝিনুকের মাংশল অংশ ইত্যাদি দিয়ে খুব সহজেই চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরী করা যায়। নীচে চিংড়ির কয়েকটি সম্পূরক খাদ্য তৈরীর নমুনা দেয়া হলো -

খাদ্য উপাদান	খাদ্য উপাদানের শতকরা হার (%)		
	নমুনা ১	নমুনা ২	নমুনা ৩
১। চালের কুঁড়া	৩০	৩০	৩০
২। গবাদিপশুর নাড়ি-ভূঁড়ি	৩৫	-	-
৩। আটা	১০	-	১০
৪। গমের ভুসি	১৫	২০	১০
৫। সরিষার খৈল	-	২০	১০
৬। ফিস মিল	১০	৩০	৪০
মোট	১০০	১০০	১০০

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

১. চিংড়ি সাধারনতঃ রাতে খাবার গ্রহন করে। তাই চিংড়ির খাবারকে সন্ধ্যা বা রাত্রিতে প্রয়োগ করতে হবে।
২. চিংড়ির দেহ ওজনের অনুপাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার দিতে হবে।
৩. পিলেট জাতীয় খাবার পুকুরের চারিদিকে পাড়ের কাছাকাছি ছিটিয়ে দিতে হবে।
৪. বাঁশের খাঁচায় খাদ্য সরবরাহ করা হলে ৩×২×১ মিটার আকৃতির বাঁশের খাঁচা তৈরী করে তাতে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে।
৫. মাঝে মাঝে ঘের/পুকুরে জাল টেনে চিংড়ির স্বাস্হ্য পরীক্ষা করে খাবার প্রয়োগের অনুপাত কম-বেশী করতে হবে।

অনুশীলনী (Activity)

ধরুন, আপনার একটি চিংড়ি খামার আছে। আপনার খামারের জন্য ১নং নমুনা অনুযায়ী ৫০০ কেজি সম্পূরক খাবার তৈরি করতে হবে। কোনটি কি পরিমাণে ব্যবহার করেবেন তার একটি সারণী তৈরী করুন।

সারমর্মঃ

চিংড়ি সর্বভূক শ্রেণীভূক্ত প্রাণী। এরা পঁচা জৈব পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া, ডায়াটম জাতীয় শেওলা, পচনশীল প্রাণীদেহ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে থাকে। তবে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি এবং অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্যের জোগান দেওয়া উত্তম। আজকাল বিভিন্ন দেশে উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি পোনার লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাদ্যের চাষ করা হচ্ছে। আধা-নিবিড় ও নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পুকুরের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাদ্য পুষ্টি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয়। চালের কুঁড়া, গমের ভূসি, ফিস মিল, সরিষার খৈল ইত্যাদি উপাদান পরিমিত পরিমাণ ব্যবহার করে খুব সহজেই চিংড়ির সম্পূরক খাবার তৈরী করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নীলচে সবুজ শেওলা (Blue green algae) কোনটি?
ক) স্পাইরিউলিনা
খ) ডেসমিডস
গ) নেভিকুলা
ঘ) সিনেড্রা

২। ক্রাস্টাসিয়া জাতীয় প্রাণী কোনটি?
ক) ময়না
খ) সাইক্লপ্স
গ) আর্টেমিয়া
ঘ) ড্যাফনিয়া

৩। ডায়াটম জাতীয় শেওলা চাষে পানিতে ইউরিয়া, এসএসপি এবং সোডিয়াম/পটাশিয়াম সিলিকেট এর অনুপাত কোনটি?
ক) ১০০: ১০০: ৫
খ) ১০০: ১০: ৫
গ) ১০০: ১০: ৫০
ঘ) ১০০: ১০০: ৫০

৪। চিংড়ির প্রাণী জাতীয় খাদ্য তৈরীতে রাসায়নিক সার (ইউরিয়া, টিএসপি ও পটাশিয়াম) এর অনুপাত কোনটি?
ক) ৫: ১০: ৫
খ) ১০: ৫: ৫
গ) ১০: ১০: ৫
ঘ) ৫: ১০: ১০

উত্তরঃ ১। ক   ২। গ   ৩। খ   ৪। খ

পাঠ ২২.৩

স্বাদু ও লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কিভাবে গলদার সাথে মাছের মিশ্র চাষ করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাগদার ঘের/পুকুর নির্মাণের পূর্বশর্ত সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোনা মজুদ পূর্ব ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সমূহ ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।

মাছ চাষের ন্যায় বদ্ধ স্বাদু পানিতেও চিংড়ি চাষ সম্ভব। আমাদের দেশে স্বাদু পানিতে সাধারনত: গলদা চিংড়িরই চাষ হয়ে থাকে। স্বাদু পানিতে চিংড়ি চাষ মূলত: দুই প্রকারের; যথা- ক) একক চিংড়ি চাষ খ) বিভিন্ন মাছের সাথে মিশ্র চাষ।

ক) একক চিংড়ি চাষ

দ্রুত বৃদ্ধি এবং অধিক ফলন নিশ্চিতের জন্যে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত -

- পুকুরের অবাঞ্ছিত মাছ/শত্রু নিধন করা
- পুকুরের আগাছা পরিস্কার করা
- উপযুক্ত পরিমান চুন প্রয়োগ করা
- চিংড়ি চারা মজুদের আগে সার প্রয়োগে পুকুরের স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- পরিমিত পরিমান চিংড়ি চারা মজুদ করা
- সম্পুরক খাবারের জোগান দেয়া
- চাষ শেষে পুকুরের পানি কমিয়ে মজুদ চিংড়ি আহরনের ব্যবস্থা করা।

চাষ পদ্ধতি

পুকুরের আগাছা ও অবাঞ্ছিত মাছ/শত্রু নিধনের পর স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে অজৈব ও জৈব সার প্রয়োগের পূর্বে হেক্টর প্রতি ২০০ কিলোগ্রাম চুন দেওয়া প্রয়োজন। চিংড়ির পুকুরে জৈব সার হিসাবে গোবর এবং অজৈব সার হিসাবে ইউরিয়া ও সিঙ্গল সুপার ফসফেট (এসএসপি)

নিম্মোক্ত পরিমানে প্রয়োগ করা যায় ঃ

সার	পরিমান (হেক্টর প্রতি)
মুরগীর বিষ্ঠা	২৫০ কিলোগ্রাম
গোবর	১০০০ কিলোগ্রাম
ইউরিয়া	৫০ কিলোগ্রাম
এসএসপি	৫০ কিলোগ্রাম

সার প্রয়োগের ৪-৬ দিনের মধ্যেই পুকুরের পানিতে খাদ্যকনার সংখ্যা উলে- খযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পায়, ফলে পানি সবুজ দেখায়। অত:পর ২০-৬০ মিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চিংড়ি চারা হেক্টর প্রতি ২৫,০০০-৩০,০০০ পরিমান মজুদ করা যায়। তবে উন্নত ব্যবস্থাপনায় বিশেষত: পুকুরের পানিতে কৃত্রিম পানি প্রবাহের সাহায্যে স্রোত সৃষ্টি করে চিংড়ির সংখ্যা ৪০,০০০-৫০,০০০ পর্যন্ত মজুদ করা সম্ভব। চিংড়ি চাষকালে পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুনাবলীর পরিবর্তনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। পানির অম্লমান মাত্রা যাতে ৭.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন (৫-৮ পিপিএম)। তাছাড়া পুকুরের বিভিন্ন স্থানে বিষাক্ত নয় এমন সব গাছের ডালপালা কিংবা খেজুর, তাল বা নারিকেল পাতা রেখে দেওয়া ভাল। এতে চিংড়ি আপদ কালীন সময়ে সেগুলোকে আশ্রয় স্থল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

চিংড়ির ভাল ফলনের জন্য পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার দিতে হয়। গলদা চিংড়িকে পরিপূরক খাবার হিসাবে চালের কুঁড়া, শামুক-ঝিনুকের মাংশল অংশ ইত্যাদি দেওয়া চলে। এভাবে ৪-৫ মাসেই চিংড়ি আহরণের উপযোগী আকারে পরিনত হয়।

খ) বিভিন্ন মাছের সাথে চিংড়ির মিশ্র চাষ

গলদা চিংড়ি বিভিন্ন মাছের সাথে একত্রে চাষ করা সম্ভব। বিভিন্ন মাছের সাথে গলদা চিংড়ির এই একত্রে চাষকে মিশ্র চাষ বলে। এরূপ মিশ্র চাষকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-গলদার সাথে মাছের চাষ এবং মাছের সাথে গলদার চাষ।

গলদার সাথে মাছের মিশ্র চাষ

পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে পুকুরের সর্বস্ড়রের খাবারের পূর্ণ ব্যবহার। চিংড়ি সাধারনত: পুকুরের তলদেশের খাবার খেয়ে থাকে। একক ভাবে চিংড়ি চাষ করলে পুকুরের উপরিস্তরের খাবার অব্যবহৃত থাকে। তাই এইসব পুকুরে উপরিভাগের খাবার খায় এমন মাছ চাষ করলে সবস্তরের খাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে গলদার সাথে হেক্টর প্রতি ২৫০ থেকে ৩৫০টি কাতলা বা সিলভার কার্প মাছ মজুদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

> চিংড়ি সাধারনত: পুকুরের তলদেশের খাবার খেয়ে থাকে।

মাছের সাথে গলদার মিশ্র চাষ

এ পদ্ধতিতে পুকুরের প্রধান ফসল হচ্ছে মাছ এবং গলদা চিংড়িকে একত্রে চাষ করে বাড়তি ফলন পাওয়া যায়। চিংড়ি যেহেতু তলদেশের খাবার গ্রহন করে তাই এ জাতীয় মিশ্র চাষে নীচের স্তরে খাবার গ্রহনকারী মাছ মজুদ করা যাবে না। সাধারনত: মৃগেল, কালবাউস, মিরর কার্প জাতীয় মাছ এ ধরনের মিশ্র চাষে মজুদ না করাই ভাল। এ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৪০০০ থেকে ৫০০০ গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের পদ্ধতি

আমাদের দেশে লোনা পানিতে বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি পাওয়া যায়। তন্মদ্ধে বাগদা চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়ে থাকে।

বাগদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি

বাগদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত -

- পুকুর বা ঘের নির্মাণ
- পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা
- পোনা নির্বাচন ও মজুদ করন
- পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুর বা ঘের নির্মান

- সাধারনত: উপকূলীয় এলাকায় যেখানে জোয়ার ভাটার প্রভাব থাকে সেখানেই বাগদা চিংড়ি চাষের উপযোগী এলাকা।
- পুকুর বা ঘেরের আয়তন ১-১০ হেক্টর হলে ভাল।
- পুকুরে তলদেশ সমতল হতে হবে।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপকরণ সরবরাহ এবং বাজারজাত করণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- পুকুর বা ঘেরের মাটি এবং পানির অম্লমান যথাক্রমে ৫-৬.৫ এবং ৭-৮.৫ হতে হবে।

পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

- পুকুরের/ঘেরের তলদেশ এবং পাড়ের আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- পুকুরের তলদেশ ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।
- পানি ঢুকানো ও বের করার গেইটে জাল স্থাপন করতে হবে যাতে রাক্ষুসে মাছ বা ক্ষতিকর প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে।
- পুকুরের তলদেশ লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে মাটির অম্লমান অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করতে হবে (সারনী -১)।
- পুকুরে হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি জৈবসার (গোবর) এবং অজৈব সারের মধ্যে ইউরিয়া ৩০-৫০ কেজি এবং ৩০-৫০ কেজি টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।
- এর পর জোয়ারের পানি প্রবেশ করিয়ে পানির উচ্চতা ৪০-৫০ সেমি করতে হবে এবং ১ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। পানির রং হালকা সবুজ হলে বুঝতে হবে পুকুরে পোনা ছাড়ার উপযোগী সময় হয়েছে।

সারনী ১: চুন প্রয়োগের মাত্রা

মাটির অম্লমান	চুন (কেজি/হেক্টর)
৪.০	১১০০
৪.৫	৮৫০
৫.০	৭০০
৫.৫	৫৫০
৬.০	৩৫০
৬.৫	১৭৫
৭.০ ও বেশী	প্রয়োজন নেই

পোনা নির্বাচন ও মজুদকরণ

- সুস্থ্য ও সবল পোনা নির্বাচন করতে হবে। সুস্থ্য পোনার দেহ সাধারনতঃ বেশ স্বচ্ছ ও সোজা হয় এবং সাঁতার কাটার সময় পুচ্ছ পাখনা বেশ ছড়ানো অবস্থায় থাকে।
- হেক্টর প্রতি সাধারনতঃ ৩০,০০০ - ৫০,০০০ টি পোনা মজুদ করা যায়।
- পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার সাথে খাপ খাইয়ে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

- পোনা মজুদের ৪-৫ সপ্তাহ পরে পানির গভীরতা বাড়িয়ে ৭০-১০০ সেমি করতে হবে।
- প্রতি অমাবশ্যা-পূর্নিমায় ৪০-৫০% পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- পানির স্বচ্ছতা ৪০ সেমি এর বেশী হলে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সাধারনতঃ অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার 'জো' এর সময় বাগদা চিংড়ি আহরণ করা হয়।

অনুশীলনী **(Activity)**

ধরুন, আপনার বাড়ীর পাশে হারুন সাহেবের ২০ শতাংশের একটি পুকুর আছে। উনি ঐ পুকুরে গলদার সাথে মাছের চাষ করতে চান। আপনি এ ব্যাপারে কিভাবে পরামর্শ দিবেন তা যুক্তি সহকারে লিখুন।

সারমর্মঃ

মাছ চাষের ন্যায় বদ্ধ পানিতে চিংড়ি চাষ করা যায়। আমাদের দেশে সাধারনতঃ স্বাদু পানিতে গলদা এবং লোনা পানিতে বাগদার চাষ করা হয়। গলদাকে একক ভাবে বা বিভিন্ন মাছের সাথে মিশ্র চাষ করলে পুকুরের উপরিস্তরের খাবার অব্যবহৃত থাকে। তাই পুকুরের উপরিস্তরের খাবার খায় এমন মাছ যেমন- কাতলা, সিলভার কার্প বা থাই স্বরপুঁটি মজুদ করলে সর্বস্তরের খাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে ২০-৬০ মিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট্য চিংড়ি চারা হেক্টর প্রতি ২৫,০০০-৩০,০০০ পরিমান মজুদ করা যায়। বাগদার ক্ষেত্রে পুকুর বা ঘের যথাযথভাবে প্রস্তুত করে জোয়ারের লোনা পানি প্রবেশ করাতে হয়। সার প্রয়োগের পর পুকুরের পানির রং হালকা সবুজ হলে পোনা ছাড়তে হবে। সাধারনতঃ হেক্টর প্রতি ৩০,০০০ - ৫০,০০০ টি বাগদা পোনা মজুদ করা যায়। পোনা মজুদের পর প্রতি অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় ৪০-৫০% পানি পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণতঃ অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার "জো" এর সময় বাগদা চিংড়ি আহরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিংড়ি চাষের পুকুরে অজৈব ও জৈব সার প্রয়োগের পূর্বে হেক্টর প্রতি কত কিলোগ্রাম চুন দেয়া দরকার?
ক) ১০০ কেজি
খ) ২০০ কেজি
গ) ৪০০ কেজি
ঘ) ৫০০ কেজি

২। চিংড়ি চাষের পুকুরে নারিকেল, তাল বা খেঁজুর পাতা রাখা হয় কেন?
ক) আপদকালীন সময়ে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করে
খ) চিংড়ির খাবার হিসাবে ব্যবহার হয়
গ) প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধির জন্য দেয়া হয়
ঘ) সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়

৩। স্বাদু পানির একক চিংড়ি চাষে সাধারনত: হেক্টর প্রতি কি পরিমান পোনা মজুদ করা হয়?
ক) ৫,০০০-১০,০০০
খ) ১০,০০০-১৫,০০০
গ) ২৫,০০০-৩০,০০০
ঘ) ৪০,০০০-৫০,০০০

৪। বাগদা চাষে কোনটি মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা নয়?
ক) হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি চুন প্রয়োগ করা
খ) পোনা মজুদের ৪-৫ সপ্তাহ পরে পানির গভীরতা বাড়িয়ে ৭০-১০০ সেমি করা
গ) প্রতি অমাবশ্যা-পূর্নিমায় ৪০-৫০% পানি পরিবর্তন করা
ঘ) পানির স্বচ্ছতা ৪০ সেমি এর মধ্যে রাখা হয়।

উত্তর: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠ ২২.৪

চিংড়ির রোগবালাই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- চিংড়ির বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের লক্ষণ ও বিস্তার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসজনিত রোগের বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছত্রাকজনিত ও অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবিত জীব মাত্রই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চিংড়িও তার জীবদ্দশায় নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। চিংড়ির পুকুরে অনেক সময় আবর্জনা পঁচে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং তলায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস জমা হয় ফলে পুকুরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে চিংড়ি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। চিংড়ির রোগবালাই নানাভাবে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে রোগবালাই সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা প্রয়োজন। চিংড়ির রোগের প্রধান কারণগুলো হলো জলজ পরিবেশগত চাপে চিংড়ি দূর্বল হয়ে পড়লে রোগ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এসব রোগের কারণের মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, বিভিন্ন পরজীবি এবং অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন প্রকার কারণ।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের সংক্রমন ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। জলজ পরিবেশে বেশী পরিমানে জৈব পদার্থের উপস্থিতি এবং খাদ্যকনা সমূহের পচনের ফলে পুকুরের পানির পরিবেশ নষ্ট হয়। ফলে চিংড়ি নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। নীচে এসব রোগ সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

ভিবরিও (*Vibrio*) ঃ

রোগের জীবাণু ঃ এই রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম ভিবরিও (*Vibrio sp.*)।
রোগের বিস্তার ও লক্ষন ঃ মোহনা ও লোনা পানিতে এরা ব্যাপকভাবে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া চিংড়ির দেহের পিছনের অংশ ও লেজে আক্রান্ত করে ও রক্তে প্রবেশ করে। ভিবরিও এর আক্রমনে চিংড়ির পদ উপাঙ্গের অগ্রভাগে পচন ধরে, উপাঙ্গ স্ফীত এবং বর্নহীন হয়।
প্রতিকার/চিকিৎসা ঃ

- চাষ এলাকায় পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।
- প্রতিদিন খামারের ৮০-৯০% পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- Quinoline ও Tetracycline ২-৩ গ্রাম/কেজি খাদ্য/৫-৭ দিতে হবে।

চিংড়ির ক্ষেত্রে ভাইরাস জনিত রোগগুলো হচ্ছে- মনোডন বেকুলো ভাইরাস, মস্তক হলুদবর্ণ রোগ, চায়না ভাইরাস ইত্যাদি।

ভাইরাসজনিত রোগ

ভাইরাস এর কারনে যে সমস্ত রোগ হয় তাকে ভাইরাসজনিত রোগ বলে। চিংড়ির ক্ষেত্রে ভাইরাসজনিত রোগগুলো হচ্ছে- মনোডন বেকুলো ভাইরাস, মস্তক হলুদবর্ন রোগ, চায়না ভাইরাস ইত্যাদি।

মনোডন বেকুলো ভাইরাস (MBV) ঃ

রোগের বিস্তার ও লক্ষণ ঃ পুকুরের অস্বাভাবিক পরিবেশ এই রোগের জন্য দায়ী। এই রোগের কারনে চিংড়ি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আকারে মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ এই রোগের সঠিক কোন চিকিৎসা নেই। সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন-

- অতিরিক্ত পোনা মজুদ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পুষ্টিসম্মত খাবার প্রয়োগ করতে হবে।
- খামারের লবনাক্ততা, তাপমাত্রা এবং অম্লমান ঠিক রাখতে হবে।

এস্তক হলুদ বর্ণ রোগ ঃ

রোগের বিস্ড়্রর ও লক্ষণ ঃ এই রোগে যদি একবার মড়ক শুরু হয় তা হলে ২-৩ দিনের মধ্যে খামারের সব চিংড়ি মারা যায়। এই রোগের প্রধান সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো দেহ ফ্যাকাশে বর্ণ এবং শিরোবক্ষ এলাকা হলুদ বর্ণ ধারন করে। খালি চোখে এই হলুদ বর্ণ রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে।

প্রতিকার ঃ এই রোগে ঔষধ প্রয়োগে কোন কাজ হয় না। তাই সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য

- খামারে ক্লোরিন প্রয়োগ করা হয়।
- পুকুরের স্বচ্ছতা ৪০ সেমি এর মধ্যে রাখতে হবে।
- চুন (১০০-৩০০ কেজি/হেক্টর/২-৩ দিন/সপ্তাহ) প্রয়োগ করলে এই রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

চায়না ভাইরাস রোগ ঃ

রোগের বিস্তার ও লক্ষণ ঃ এই রোগে আক্রান্ত হলে ৩-১০ দিনের মধ্যে খামারের ১০০ ভাগ চিংড়ি মারা যায়। এই ভাইরাসে প্রাথমিক অবস্থায় চিংড়ি দূর্বল এবং অলস হয়ে পড়ে, চিংড়ি পুকুরের পানির উপরের স্তরে ভাসতে দেখা যায়। চিংড়ির খাদ্য গ্রহনে অনীহা দেখা দেয়। চিংড়ির দেহের বর্ণ ফ্যাকাশে ও লালচে দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ যেহেতু এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই সেহেতু এই রোগে ঔষধ প্রয়োগ করে লাভ নেই। রোগ প্রতিরোধক হিসাবে কিছু ঔষধী গাছ যেমন-নিমগাছ, পুষ্টি সম্পন্ন খাবার ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায়।

ছত্রাকজনিত রোগ

লার্ভাল মাইকোসিস ঃ

রোগের বিস্তার ও লক্ষণ ঃ প্রায় সব পিনাইড চিংড়ি হ্যাচারীতে এই রোগের আক্রমন দেখা যায়। এই রোগ সাধারনতঃ চিংড়ির ডিম, নপলিয়াস, প্রটোজইয়া, মাইসিস এবং পোষ্ট লার্ভা পর্যায়ে আক্রমন করে।

প্রতিকার/চিকিৎসা ঃ ট্রিফ্লেন (Treflan) বা Trifluralin ০.২ পিপিএম/দিন প্রয়োগ করা যায়।

স্যাপ্রোলেগনিয়া (Saprolegnia) ঃ

রোগের বিস্তার ও লক্ষন ঃ এই ছত্রাক চিংড়ির ফুলকায় আক্রমন করে। প্রথমে ফুলাকায় অসংখ্য কালো ফোটা দাগ দেখা যায়। বেশী আক্রান্ত হলে ফুলকার লেমিলি নষ্ট হয় ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে।

প্রতিকার/চিকিৎসা ঃ প্যারাজাইন ০.১-০.৫ পিপিএম হারে ৩-৪ দিন প্রয়োগ করতে হবে।

অপুষ্টিজনিত রোগ ঃ

খাদ্যে উপযুক্ত পরিমানে পুষ্টি উপাদানসমূহ না থাকলে পুষ্টির অভাব জনিত রোগ হয়। চিংড়ির খাদ্যে পুষ্টির মান সঠিক পরিমানে না থাকলে চিংড়িও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার ও লক্ষণঃ খাদ্যে অ্যামাইনো এসিড, কোলেষ্টরল, লিনোলিক এসিড এবং পটাশিয়াম উপাদান না থাকলে এই রোগ হয়। ফলে চিংড়ির দেহ বৃদ্ধি ঘটে না এবং চিংড়ি দূর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার/চিকিৎসাঃ পরিমিত পরিমান পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করতে হবে।

সারমর্মঃ

অন্যান্য প্রাণীর মত চিংড়ি তার জীবদ্দশায় নানবিধ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চিংড়ি যেসব কারনে রোগে আক্রান্ত হয় সেগুলো হলো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, বিভিন্ন পরজীবি এবং অপুষ্টিজনিত কারণ। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে ভিবরিও অন্যতম। ভাইরাসজনিত রোগের মধ্যে মনোডন বেকুলো ভাইরাস (MBV), মস্তক হলুদ বর্ণ রোগ, চায়না ভাইরাস রোগ উল্লেখযোগ্য। ভাইরাসজনিত রোগের সঠিক কোন চিকিৎসা নেই। সুষ্ঠ খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমন থেকে চিংড়ি রক্ষা করা যায়। চিংড়ির ছত্রাকজনিত রোগগুলো হলো লার্ভাল মাইকোসিস এবং স্যাপ্রোলেগনিয়া। এছাড়াও উপযুক্ত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগ হয়। এর ফলে চিংড়ির দেহ বৃদ্ধি ঘটে না এবং চিংড়ি দূর্বল হয়ে পড়ে। পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োগে এই রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিংড়িতে ভিবরিও এর কারণ কি?
ক) ভাইরাস খ) ব্যাকটেরিয়া
গ) ছত্রাক ঘ) পরজীবি

২। মনোডন বেকুলো ভাইরাসে চিংড়ির কি হয়?
ক) চিংড়ি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আকারে মড়ক দেখা দেয়
খ) চিংড়ির বর্ণ হলুদ হয়ে পড়ে
গ) চিংড়ির মস্তক ও লেজ খসে পড়ে
ঘ) চিংড়ি পানিতে লাফালাফি করতে থাকে

৩। স্যাপ্রোলেগনিয়াতে (Saprolegnia) চিংড়ির দেহের কোথায় আক্রমন ঘটে?
ক) মাথায় খ) লেজে
গ) ফুলকায় ঘ) পায়ে ও দেহের মধ্যখানে

উত্তর : ১। খ ২। খ ৩। গ

পাঠ ২২.৫

চিংড়ি ও মৎস্য রপ্তানির অর্থনৈতিক প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর কি পরিমান চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয় তা বলতে পারবেন।
- চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রতিবছর কি পরিমান আয় হয় তা বলতে পারবেন।
- এই খাতে আমাদের দেশের কি পরিমান লোক জড়িত আছে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য উপখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় খাতের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদানের চেয়েও জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬০% যোগান দেয় মাছ। তাছাড়া দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০% লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬০% যোগান দেয় মাছ।

আমাদের দেশের জাতীয় আয়, পুষ্টি সরবরাহ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমরা দেখতে পাই ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের প্রায় ৩.৭৪% আসে মৎস্য উপখাত থেকে এবং এই অর্থবছরে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৫.৯%। আমাদের দেশের প্রায় ১.৪৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। রপ্তানি আয়ে জনশক্তি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই মৎস্য খাতের অবস্থান। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট ৭২৮৮৮ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি করে ৩২৪৩.৪১ কোটি টাকা আয় হয়েছে এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭৭৬৪৩ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি করে ৩৪০৮.৫২ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ইউরোপীয় দেশসমূহ, আমেরিকা, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ ৩২৭৭ টন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩.৫ কোটি টাকা অর্জন করেছিল। বর্তমানে চিংড়ি ও মৎস্যজাত পন্য সামগ্রী রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা আশাতীত অর্জিত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উর্ধ্বমূখী গতিধারা অব্যাহত আছে। নিম্নোক্ত সারণি থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি বানিজ্য

ও জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য ও অন্যান্য মৎস্যজাত পণ্যের গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

পরিমাণ : মে: টন

মূল্য : কোটি টাকা

বৎসর	হিমায়িত চিংড়ি		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবনাক্ত ও পানিশূন্য মাছ		কচ্ছপ/কাকড়া/ইল		হাঙ্গর পাখনা ও ফিস মাউস		মোট		মোট রপ্তানি আয়ের পরিমান (%)
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮০	১১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৩৭০৪	৩৩৫২.৮৯	৪.৯
০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৬৩.৯২	২৩৫১৫	৪৯৫.৪৬	২১০	২.৬৭	৬৫৮	২৬.৯৭	৪৩৯	৪.৮৮	২৬৬	১.৮২	৭৫২৯৯	৩৩৯৬.২৮	৪.০৪
০৮-০৯	৫০৩৬৮	২৭৪৪.১২	১৯২৯৪	৪৫০.৯০	৩৪১	১১.৯৯	৮৪	৩.৯২	১২১৭	১১.৯৮	২৭৬	১.৭৭	৭২৮৮৮	৩২৪৩.৪১	৩.০০
০৯-১০	৫১৫৯৯	২৮৮৫.২১	২১৪৬৪	৪৫৮.১১	৬২২	২৫.০৬	০	০	৬৯২	১০.৪১	৯৫৫	১২.৬৬	৭৭৬৪৩	৩৪০৮.৫২	২.৭০

উৎসঃ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সংকলন ২০১১, মৎস অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

সারমর্মঃ

আমাদের দেশের জাতীয় আয়, পুষ্টি সরবরাহ দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। রপ্তানি আয়ে জনশক্তি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই মৎস্য খাতের অবস্থান। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭৭৬৪৩ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্য জাত পন্য রপ্তানি করে ৩৪০৮.৫২ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রপ্তানি আয়ে মৎস্য ও চিংড়ি খাতের অবস্থান কোনটি?
ক) জনশক্তি ও গার্মেন্টস শিল্পের আগে
খ) জনশক্তি ও গামেন্টস শিল্পের পরে
গ) জনশক্তি ও গার্মেন্টস শিল্পের মাঝে
ঘ) উপরের কোনটিই নয়

২। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের শতকরা কত ভাগ মাছ থেকে আসে?
ক) প্রায় ৩০%
খ) প্রায় ৪০%
গ) প্রায় ৫০%
ঘ) প্রায় ৬০%

উত্তর: ১। খ ২। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন -ইউনিট-২২
সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি চাষাবাদ পদ্ধতি গুলোর নাম লিখুন।
২। সনাতন পদ্ধতি এবং নিবিড় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করুন।
৩। বাংলাদেশের চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা আলোচনা করুন।
৪। চিংড়ির উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাদ্য সমূহের একটি তালিকা লিখুন।
৫। প্রাকৃতিক খাদ্য বলতে কী বোঝায়?
৬। চিংড়ির উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনা দিন।
৭। সম্পূরক খাদ্য কি? চিংড়ির সম্পূরক খাদ্যে কি কি পুষ্টিমান থাকা উচিত?
৮। চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরী এবং প্রয়োগ পদ্ধতির বর্ণনা দিন।
৯। একক চিংড়ি চাষ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১০। বাগদা চিংড়ি চাষাবাদ পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা লিখুন।
১১। ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ কি? চিংড়ির একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের বর্ণনা দিন।
১২। মনোডন বেকুলা ভাইরাসের লক্ষণ ও প্রতিকারের বর্ণনা দিন।
১৩। চিংড়ির মস্তক হলুদ বর্ণ রোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১৪। চিংড়ির ছত্রাক জনিত রোগের বর্ণনা লিখুন।
১৫। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি ও মৎস্যজাত পন্যের ভূমিকা লিখুন।